বারি জোয়ার-১

বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন কলাকৌশল ও ব্যবহার

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১।

বারি জোয়ার-১ এর বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন কলাকৌশল ও ব্যবহার

ভূমিকা

জোয়ার/সরগম (*Sorghum bicolor* L. Moench) বাংলাদেশে একটি গৌণদানা জাতীয় ফসল। বিশ্বে উৎপাদনের দিক দিয়ে জোয়ারের স্থান পঞ্চম। ধান, গম, ভুট্টা ও বার্লির পর জোয়ারের স্থান। জোয়ার মূলত আফ্রিকার একটি ফসল। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ও বিভিন্ন ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে আফ্রিকার কিছু কিছু দেশের গ্রামীন সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য হিসেবে জোয়ার প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকার খরা প্রবণ এলাকাতে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানের জন্য জোয়ার ভুট্টা থেকে বেশি কার্যকর। আমাদের দেশে জোয়ার গৌণদানা জাতীয় ফসল হলেও, তা পুষ্টিমান ও ঔষধীগুণে ভরপুর। এই ফসল গভীর মূলী হওয়ার কারণে খরা প্রবণ ও জলাবদ্ধ এলাকায় টিকে থাকতে পারে। দক্ষিণাঞ্চলের লবনাক্ত এলকাসমূহে এ ফসল চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। দেশের কিছু কিছু জায়গায় সীমিত আকারে এর চাষাবাদ হচ্ছে। খরা প্রবণ, চর অঞ্চল ও জলাবদ্ধ এলাকায়ও জোয়ার চাষ করা সম্ভব। রবি ও খরিফ দুই মৌসুমেই জোয়ারের চাষ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং দেশের অন্য কিছু জেলা যেমন: মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, চাঁপাইনবাবগঞ্জে জোয়ারের চাষ হয়। খরিফ মৌসুমে পাহাড়ী এলাকায় জুমে যে সরগম আবাদ হয়, তা "ভাদুই জোয়ার" নামে পরিচিত। এটা তাদের কাছে একটি জনপ্রিয় ফসল। এছাড়া রবি মৌসুমেও দেশের কিছু কিছু এলাকায় সরগম চাষ হয়। জোয়ার গৌণদানাদার ফসল হলেও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে আগামীতে বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় দানাদার ফসল হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জোয়ার মানুষের খাবার ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জোয়ার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত দরকার। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ জোয়ারের উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে লবনাক্ততা সহনশীল বারি জোয়ার-১ (BARI Sorghum-1) নামে একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। নিম্নে বারি জোয়ার-১ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

জাত উদ্ভাবনের ইতিবৃত্ত

লবনাক্ত এলাকায় চাষের উপযোগী সরগমের লাইন সনাক্ত করার জন্য উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের গ্রীন হাউজে সতেরটি লাইন থেকে একটি লাইন (IS-19153) সনাক্ত করা হয়, যা চারা অবস্থায় ১২ ডিএস/মি. পর্যন্ত লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে খুলনা এবং সাতক্ষীরায়ও উক্ত লাইনটি ৮-১০ ডিএস/মি. লবনাক্ততা সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে। বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন পর্যায়ে বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষায় ভাল হিসেবে প্রতিয়মান হওয়ায় IS-19153 লাইনটি ২০২০ সালে বারি জোয়ার-১ (BARI Sorghum-1) নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জোয়ারের জাত হিসেবে অবমুক্ত হয়।

বারি জোয়ার-১ এর বৈশিষ্ট্য

বারি জোয়ার-১ জাতটির কান্ড শক্ত ও গাছ তুলনামূলক খাট। গাছের গড় উচ্চতা ১৪৬ সেমি.। তাই ঝড়-বাতাসে সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না। জাতটির মঞ্জুরী খাড়া (erect), লম্বা, আটসাট (compact) এবং প্রতিটি মঞ্জুরীর ওজন ৬৩.১ গ্রাম। দানা গোলাকার ও সাদা (white) বর্ণের এবং হাজার দানার ওজন ৩৮.০ গ্রাম। জাতটির দানা থেকে খৈ তৈরী করা হয় এবং খৈ ফোটার (popping %) শতকরা হার ৭৫। জাতটি রবি মৌসুমে ১৪৩-১৫৭ দিনে পরিপক্ক হয়। বাংলাদেশের সকল এলাকায় এই জাতটি চাষ করার উপযোগী। জাতটির রবি মৌসুমে গড় ফলন ৩.৫৬ টন/হে. এবং লবনাক্ত এলাকায় (১২ ডিএস/মি.) গড় ফলন ২.১১ টন/হে.।

জোয়ারের উৎপাদন কলাকৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরী

জোয়ার এমন একটি ফসল যা কম উর্বর, অধিক কাদাযুক্ত অগভীর মাটি যেখানে ভুট্টা উৎপাদন সহজ নয় সে সকল জমিতে চাষাবাদ হয়। খরাযুক্ত জমিতে (পিএইচ ৫.৫-৮.৫) জোয়ার ভালো হয়। জমি "জো" অবস্থায় ৩-৪টি আড়া-আড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। জমি চাষ দেওয়ার পূর্বে গোবর, পচাঁ আবর্জনা ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমির ঢাল বুঝে চারপাশে ও মাঝখানে আড়াআড়ি নালা তৈরী করতে হবে। এতে করে জমিতে সেচ দিতে ও অতিরিক্ত পানি বের করতে সুবিধা হয়।

সারের পরিমাণ

জমি তৈরীর সময় প্রতি হেক্টর জমিতে ৫-৭ টন গোবর সার দিতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট সার যথাক্রমে ২৬০ কেজি, ৩০০ কেজি, ১০০ কেজি, ৪৫-৫৫ কেজি, ৩-৪ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে ইউরিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ ও অন্যান্য সারের সবটুকুই মাটির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে। দ্বিতীয় ভাগ ইউরিয়া বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়। তৃতীয় ভাগ গাছে ফুল আসার সময় দিতে হয়। সেচের ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা উত্তম।

বীজ শোধণ

বীজকে রোগবালাই মুক্ত করার জন্য বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করা উচিৎ।

বীজ বপনের সময়

জোয়ার এমন একটি ফসল যা রবি ও খরিপ-১ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। জমির প্রকার ও অঞ্চল ভেদে বপন কালের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে। রবি মৌসুমে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত (কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপন করা যায়। খরিপ-১ মৌসুমে মার্চ-এপ্রিল (ফাল্গুন-চৈত্র) মাসে বীজ বপন করা হয়।

বীজের পরিমাণ

জোয়ারের বীজ সারিতে বপন করা হয়। বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ১০ কেজি।

বীজ বপনের দূরত্ব

সারি থেকে সারি ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেমি.।

আন্তঃপরিচর্যা

বীজ বপনের পর চারা ঘন হলে চারা গজানোর পর পাতলা করে দিতে হবে। জোয়ারের অনেক কুশি বের হয়। ভালো ফসলের জন্য ২-৩টি কুশি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে।

সেচ ও পানি নিস্কাশন

রবি মৌসুমে সেচ ছাড়া ভাল ফলন আশা করা যায় না। জমির প্রকার ভেদে ২-৩টি সেচ দেওয়া হয়। ১ম সেচ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর এবং ২য় সেচ ফুল আসার আগে প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে রসের পরিমাণ কম হলে তৃতীয় সেচ (দানা বাঁধতে শুরু হলে) দিতে হবে। প্রয়োজন হলে পানি নিস্কাশন করতে হবে।

ক্ষতিকর পোকা দমন

এ দেশে জোয়ারে পোকার আক্রমণ খুব একটা হয় না। তবুও সময় সময় কিছু পোকা এই ফসলে আক্রমণ করে থাকে।

পাতা খেকো লেদা পোকা

লেদা পোকা আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ গ্রাম কীটনাশক (প্রোরোক্লেইন ৫ এসজি বা ইমাকর ৫ এসজি) মিশিয়ে গাছের উপরিভাগ ভালোভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এছাড়া ফুরাডান ৫জি এর কয়েকটা দানা উপরের পাতার মধ্যে দিলে ভালো কাজ হয়।

জাব পোকা

জাব পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা সাবানের গুড়া মিশ্রিত করে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে বায়োনিম ১ ইসি বা ফাইটোমিক্স ৩ ইসি (১ মিলি.) এবং মেলাডান ৫৭ ইসি (২ মিলি.) ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়।

চিত্র-১. লেদা পোকা ও জাব পোকা আক্রান্ত গাছ

রোগ দমন

জোয়ারে পাতা ঝলসানো রোগ

এই রোগে আক্রান্ত হলে গাছের নীচের দিকের পাতায় প্রথমে ছোট ছোট লম্বা ডিম্বাকার ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায় যা পরবর্তীতে গাছের উপরের অংশেও বিস্তার লাভ করে। আক্রমণ বেশি হলে পাতা শুকিয়ে যায়। রোগ দেখা দিলে টিল্ট-২৫০ ইসি (০.১%) ১৫ দিন পরপর ৩টি স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ০.২% হারে ব্যাভিস্টিনও প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র-২. জোয়ারে পাতা ঝলসানো রোগ

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

জোয়ারের দানা বিভিন্ন রং এর হয়ে থাকে। জোয়ারের বীজ পরিপক্ক হয়েছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোয়ারের দানা ছাড়িয়ে বীজের গোড়া পরীক্ষা করতে হবে। গোড়ায় কালো দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে জোয়ারের দানা পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া দু'একটি বীজ দাঁতে কাটার পর 'কট' করে শব্দ হলে বুঝতে হবে ফসল কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে। ফসল কাটার পর রোদে ভালোভাবে শুকানোর পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দানা ছাড়াতে হবে। ছাড়ানো দানা ভালোভাবে ঝেড়ে পুনরায় রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে যাতে বাইরের বাতাস পাত্রে ঢুকতে না পারে। এছাড়া মোটা পলিথিনের থলিতেও বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

চিত্র-৩. পরিপক্ক বীজ

জোয়ারের ঔষধীগুণ

- জোয়ারে দ্রবণীয় আঁশ থাকে যা পাচনতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতায় সহায়তা করে। দৈনিক খাবারের তালিকার ৪৮% দ্রবণীয় আঁশ জোয়ার থেকে পাওয়া যায়। পেট ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও অতিরিক্ত গ্যাস প্রতিরোধে সাহায্য করে। উচ্চ পরিমাণ আঁশ রক্তে কোলেস্টরল এর মাত্রা কমিয়ে হার্টের রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- জোয়ারে এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা শরীরকে ফ্রিরেডিক্যালমুক্ত রাখে, শরীরে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয়।
- ডায়াবেটিস এর কারণে শরীরে জটিল শর্করা ভেঙ্গে সরল শর্করা তৈরী হয়। জোয়ার শরীরে প্রচুর পরিমাণ ট্যানিন তৈরী করে যা শর্করা শোষনকে বাঁধা দেয়, ফলে দেহে গ্লুকোজ ও ইনসুলিন এর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।
- জোয়ারে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম আছে যা শরীরের ক্যালসিয়ামের শোষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে ক্যালসিয়ামকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ দুইটি খনিজ দেহের হাড় গঠনে ও ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে।

- এতে প্রচুর পরিমাণ আয়রণ, কপার এবং ম্যাগনেসিয়াম আছে যা শরীরে আয়রণ গ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে এনিমিয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
- জোয়ার ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) এবং বি২ (রিবোফ্লাভিন) সমৃদ্ধ। এছাড়াও ভিটামিন বি৬ আছে যা প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার ২৪% ভিটামিন বি৬ সরবরাহ করতে সক্ষম।
- গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে ভিটামিন বি৬ এর মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণকারী সেরোটোনিন এবং নিউরো ট্রান্সমিটার উৎপাদনের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে যা মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- থাইরয়েড গ্রন্থিটির একটি অপরিহার্য হরমোন থাইরয়েডটিসাইন। জোয়ার ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ, যা থাইরয়েড গ্রন্থিগুলিকে যথাযথভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ও উল্লেখিত হরমোন উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে।
- শরীরের ওজন কমাতে সহায়তা করে।

জোয়ার এর গুরুত্ব, সম্ভাবনা ও ব্যবহার

জোয়ার বিশ্বের খরা প্রবণ এলাকায় উচ্চ ফলনশীল শস্য হিসেবে গম, ভুট্টার সাথে প্রতিযোগীতা করে টিকে আছে। জোয়ার একটি বহুমুখী শস্য যা আমরা দানা শস্য, গবাদি পশুর খাদ্য ও মিষ্টি জাতীয় খাদ্য তৈরীতে ব্যবহার করতে পারি।

১. দানা জাতীয় জোয়ার

দানা জাতীয় জোয়ার বিভিন্ন আকার ও আকৃতির হয়ে থাকে। এর শীষ গোলাকার ও আটসাট ভাবে বাধা থাকে। বিভিন্ন রং এর দানা দেখা যায়, যেমন: লাল, কমলা, তামাটে ইত্যাদি। সাদা, কালো, লাল, কমলা ও তামাটে রং এর জোয়ার শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ধূসর ও সাদা রংয়ের জোয়ার ব্যবহৃত হয় আটা করার জন্য যা খাদ্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কালো রংয়ের জোয়ার এন্টি অক্সিডেন্ট গুণ সম্পন্ন যা অন্যান্য খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকাতে প্রধান খাদ্য হিসেবে জোয়ার ব্যবহৃত হয়। জোয়ার খই হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

২. পশু খাদ্য হিসেবে জোয়ার

চরাঞ্চলে ও খরা প্রবণ অঞ্চলে খরিফ মৌসুমে গো-খাদ্যের অভাব দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের উপর নির্ভর করে জোয়ারকে চারণভূমি, খড় উৎপাদন, সাইলেজ এবং সবুজ পাতা কেটে ব্যবহার করা যায়। এভাবে জোয়ার মানুষের খাদ্যের পাশাপাশি চর ও খরা প্রবণ অঞ্চলে পশু পালন সম্প্রসারণেও সহায়ক হবে।

৩. খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে

জোয়ার সিরাপ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। আখের মত এই সিরাপ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এই সিরাপ ব্যবহারের মাধ্যমে জোয়ারের বহুমুখী ব্যবহার তরান্বিত করা সম্ভব।

৪. অন্যান্য ব্যবহার

জোয়ার এর আশঁ ওয়াল বোর্ড, বেড়া, প্যাকেজিং শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এ সকল সমগ্রী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (Recycling) করা সম্ভব।

জোয়ার থেকে তৈরীকৃত খাবার

চিত্র-৪. জোয়ারের আটা থেকে তৈরী রুটি এবং জোয়ার থেকে তৈরী খিচুরী, লাড্ডু ও বিস্কুট

জোয়ারের পুষ্টিমান

ছক ১. জোয়ার, বার্লি, গম, ভুট্টা এবং চালের পুষ্টিমানের তুলনামূলক তালিকা (প্রতি একশত গ্রাম দানায়)

পুষ্টিমান	জোয়ার	বার্লি	গম	ভুট্টা	চাল
আমিষ (গ্রাম)	১০.৬২	১১.৫০	১২.১	১১.১	৬.৪
চর্বি (গ্রাম)	৩.৪৬	১.৩০	১.৭	৩.৬	০.৪
আঁশ (গ্রাম)	৬.৭	৩.৯০	১.৯	২.৭	০.২
শ্বেতসার (গ্রাম)	৭২.০৯	৬৯.৬০	৬৯.৪	৬৬.২	৭৯.০
শক্তি (কি.ক্যা.)	৩২৯	৩৩৬	৩৪১.০	৩৪২.০	৩৪৬.
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা.)	১৩	২৬	৪৮.০	১০.০	০৯.০
ফসফরাস (মি.গ্রা.)	২৮৯	২১৫	৩৫৫.০	৩৪৮.০	১৪৩.০
লৌহ (মি.গ্রা.)	৩.০৯	৩.০	১১.৫	২.০	৪.০
কেরোটিন (মি.গ্রা.)	-	১০	২৯.০	৯০	-
থায়ামিন (মি.গ্রা.)	০.৩৩২	০.৪৭	০.৫	০.৪	০.২
রিবোফ্লাবিন (মি.গ্রা.)	০.০৯৬	০.২০	০.২	০.১	০.১
নিয়াসিন (মি.গ্রা.)	৩.৬৮৮	৫.৪০	৪.৩	১.৮	৩.৮
ম্যাগনেসিয়াম (মি.গ্রা.)	১৬৫	১২৭	১৩৮.০	১৪৪.০	৩৮.০
পটাশিয়াম (মি.গ্রা.)	৩৬৩	২৫৩	২৮৪	২৮৬.০	১১৭.০

Ref. Nutritive Value of Indian Foods
By C. Gopalan, B.V. Ramasastri and S.C. Basubramanian

রচনায়

- সাদিয়া সাবরিনা আলম
- ড. মো. মতিয়ার রহমান
- ড. মো. মোতাছিম বিল্লাহ্
- ড. ফেরদৌসী বেগম
- আফসানা হক আঁখি
- ড. মো. মোবারক আলী
- আ.ন.ম. সাজেদুল করীম
- হাসানুজ্জামান রায়হান
- সুমাইয়া হক অমি
- ড. মোছা. শাহানাজ পারভীন

সম্পাদনায়

- সাদিয়া সাবরিনা আলম
- ড. মো. মোবারক আলী

প্রকাশনায়

উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশ কাল

মার্চ, ২০২১ খ্রি.

মুদ্রণে: প্রিন্টভ্যালী প্রিন্টিং প্রেস
শিববাড়ী মোড় (ব্যাংক এশিয়া'র বিপরীত গলিতে), জয়দেবপুর, গাজীপুর।
মোবাইল: ০১৭১৬-৮৫৫৯৯৮, ই-মেইল: printvalley@gmail.com